নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ১০-০৭-২০২৩ (পৃঃ ০৫)

পাহাড়ে সবুজ বিপ্লব

ড. আমিনা খাতুন

পাহাড়ের বুকে সবুজের বিপ্লবে 'নতুন করে গড়ে উঠবে এই বাংলা। বাংলার মানুষ হাসবে। বাংলার মানুষ খেলবে। বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ায় বাস করবে। বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাবে' জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই স্বপ্নময় অমিয়বাণীর যেন সফল বাস্তবায়ন। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কৃষকদের মাঝে আধুনিক উচ্চফলনশীল ধানের জাত ও প্রযুক্তি ব্যবহার ব্যাপক উদ্দীপনা এবং আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। অসম্ভবকে সম্ভব করেছে তারা। বলছি, রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই লেকের বুকে বোরো মৌসুমে জেগে ওঠা জলে ভাসা জমির কথা।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যৌথ সমীক্ষায় দেখা গেছে, পাহাড়ে জুম চাষীরা স্থানীয় ধানের জাত আবাদ করে বছরে ৪-৮ মাসের খাবার সংগ্রহ করতে পারলেও বাকি ৪-৮ মাস খাবারের ঘাটতি থাকে। পার্বত্য অঞ্চলের তিনটি জেলায় মাঠ ফসলের উপযোগী জমির পরিমাণ মাত্র ৭৬ হাজার হেক্টর। এর মধ্যে রাঙ্গামাটি জেলায় ১৬ হাজার হেক্টর ফ্রিঞ্জল্যান্ড রয়েছে, যা জলে ভাসা জমি হিসেবে স্থানীয়ভাবে পরিচিত। আমন মৌসুমে জলে ভাসা জমিগুলো বিশেষ করে মধ্য জুন থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুরোপুরি থাকে পানির নিচে। বোরো মৌসুমে পানি কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমিগুলো জাগতে শুরু করে এবং মধ্য অক্টোবর থেকে চাষের জন্য পুরোপুরি উপযুক্ত হয়ে ওঠে। সাধারণত নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে বীজতলায় ধানবীজ বপন এবং জানুয়ারি থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারির মধ্যে জমিতে ধানের চারা রোপণ শেষ করা হয়। ধানের চারা রোপণ বিভিন্ন পর্যায়ে হয়ে থাকে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, সবচেয়ে পরে জেগে ওঠা লেকের পানির কাছাকাছি জমিটি সবচেয়ে আগে রোপণ করা হয় এবং ক্রমান্বয়ে ৭ থেকে ১০ দিন বিরতিতে তিন থেকে চারটি পর্যায়ে রোপণ কাজ সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে এপ্রিল মাসে রোপণকৃত ধান কর্তন শুরু করে চলে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত। পুনরায় পানি আসতে শুরু করে এবং চাষের জমিগুলো জলে ভাসা জমিতে পরিণত হয়। যুগের পর যুগ চলছে এই চক্রাকার পদ্ধতি। শুধু বোরো মৌসুমে স্বল্প জীবনকালের ধানের জাত চাষের মাধ্যমে প্রায় ৬.৫ হাজার হেক্টর জলেভাসা জমিকে উৎপাদনশীল করার সুযোগ রয়েছে।

পাহাড়ি কৃষকগণ সাধারণত জলে ভাসা কিছু পরিমাণ জমিতে কিছু স্থানীয় জাতের বোরো ধান, হাইব্রিড ধান, শীতকালীন সবজি, তামাক ইত্যাদি চাষ করে থাকে। স্থানীয় জাতের ফলন গড়ে ২ টন/ হেক্টর, যা অন্যান্য এলাকার তুলনায় খুব কম। হাইব্রিড ধানের ফলন যদিও প্রায় ৬ টন/ হেক্টর, কিন্তু এ সকল এলাকার নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত দরিদ্র কৃষকের প্রতিবছর চড়া দামে হাইব্রিড ধানের বীজ কিনতে হয় বিধায় তারা হাইব্রিড ধান চাষে আগ্রহী নয়।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট পাহাড়ি দুর্গম এলাকার প্রতিবন্ধকতাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে ঐ এলাকায় বসবাসরত কৃষকদের ধানের উন্নত জাত, আধুনিক উৎপাদন কলাকৌশল, বীজ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করা হয়। সেই সঙ্গে তাদের মাঝে বীজ, সার ও অন্যান্য উৎপাদন উপকরণ সরবরাহ করা হয়। পরীক্ষামূলকভাবে গত বোরো ২০২২ মৌসুমে কাপ্তাই লেক সংলগ্ন বরকল, লংগদু, জুড়াছড়ি এবং বাঘাইছড়ি উপজেলায় ৫০ হেক্টর জলে ভাসা জমিতে ব্রি ধান ৫০, ব্রি ধান ৬৩, ব্রি ধান ৮৯, ব্রি ধান ৯২ চাষ করে। স্থানীয় কৃষকদের উপস্থিতিতে আবাদকৃত ধান কর্তন করা হয়। ধানের উচ্চফলন দেখে উপস্থিত কৃষক অত্যন্ত আনন্দিত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রির প্রদর্শনকৃত জাতসমূহ আবাদে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

এ বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে বোরো মৌসুমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় রাঙ্গামাটি জেলার বরকল, লংগদু, বাঘাইছড়ি, জুড়াছড়ি এবং বিলাইছড়ি উপজেলায় প্রায় ৪০০০ হেক্টর জলে ভাসা জমিতে ব্রি ধান ৫০, ব্রি ধান ৮৮, ব্রি ধান ৮৯, ব্রি ধান ৯২ এবং ব্রি ধান ১০০ চাষ করা হয়, যার গড় ফলন পাওয়া যায় হেক্টর প্রতি ৭ টন। উচ্চফলনশীল ধানের এই জাতসমূহ কৃষকদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে দেশের খাদ্যভান্ডারে প্রায় ২৮০০০ মেট্রিক টন ধান। এটি সম্ভব হয়েছে মাত্র ৪০০০ হেক্টর জলে ভাসা জমিকে আধুনিক ধান চাষের আওতায় আনার ফলে। ইতোপূর্বে এ সকল জমি যথোপযুক্তভাবে চাষের আওতায় আনা হয়নি। ব্রি পর্যায় ক্রমে সকল জলে ভাসা জমিকে চাষের আওতায় আনার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

১৮৬০ সালের ২০ জুন রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এই তিন পার্বত্য অঞ্চলকে নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সৃষ্টি হয়। জেলা সৃষ্টির আগে এর নাম ছিল কার্পাস মহল। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা থেকে ১৯৮১ সালে বান্দরবান এবং ১৯৮৩ সালে খাগড়াছড়ি পৃথক জেলা সৃষ্টি করা হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার মূল অংশ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য শান্তিচুক্তির আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল অশান্ত ও সংঘাতময় এলাকা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী ও সুযোগ্য নেতৃত্বে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তির পর অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির পরিবেশ ও বহু প্রতীক্ষিত উন্নয়নের অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। পশ্চাৎপদ থাকা পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন কার্যক্রম বেগবান হয়। প্রায় ১৩.২ হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তনের এ অঞ্চলটিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও বাঙালি মিলে প্রায় ১৮ লাখ লোকের বসবাস, যার মধ্যে ২.৫ লাখ কৃষক পরিবার রয়েছে। এ অঞ্চলের মানুষের প্রধান পেশা কৃষি হওয়া সত্ত্বেও প্রতিকূল পরিবেশের কারণে কৃষির উৎপাদন কম এবং ফসলের নিবিড়তা ১৫৯%, যা জাতীয় শস্য নিবিড়তার তুলনায় অনেক কম। পাহাড়ি লোকজন পাহাড়ের ঢালে তথা জুমে এবং পাদদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধানসহ অন্যান্য ফসলের স্থানীয় জাত আবাদ করে, যেগুলোর অধিকাংশের ফলন কম। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আবাদযোগ্য মাঠ ফসলি জমি আছে মাত্র মোট জমির ৬ শতাংশ। সমতল জমির অভাবে এখানে মাঠ ফসলের আবাদ সম্প্রসারণের সুযোগ খুব সীমিত। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে কৃষকগণ তাদের খাদ্যের চাহিদা মেটাতে পাহাড়ের ঢালে জুমচাষ করার ফলে যেমন ভূমি ক্ষয় এবং ভূমির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়, অন্যদিকে পরিবেশের ভারসাম্যও নষ্ট হয়। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি)

কিছুকাল আগেও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা ছিল জুমচাষ ও প্রাকৃতিক বনজ সম্পদ আহরণ। প্রাকৃতিক বন কমে যাওয়া এবং দৈনন্দিন জীবন ধারণ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় অপরিকল্পিত জুমচাষ পাহাড়িদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হচ্ছে। প্রতিবছর গড়ে ০.৪ শতাংশ হারে আবাদি জমি কমছে। দেশে বর্তমান জনসংখ্যা ১৬৩.৬৫ মিলিয়ন, যা ২০৫০ সালে বেড়ে হবে ২৫০.৪০ মিলিয়ন। বর্তমানে চালের উৎপাদন প্রায় ৩৫ মিলিয়ন মে.টন, যেখানে ২০৫০ সালে চালের চাহিদা হবে ৪৪.৬ মিলিয়ন মে.টন